মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ব্যাকরণ পুস্তক

উল্লাসকর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস লেখা হয় নি। ভাষা, ব্যাকরণ তো কোনো জাতির একটু একটু করে গড়ে ওঠার, লড়াই কর ার, নিজের সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে প্রতিষ্ঠা করার, সর্বোপরি নিজের ভূমিরক্ষার লড়াইয়ের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এমনকি ভারতীয় কৃষিভিত্তিক ও কারিগর - নির্ভর সমাজের জাত, বর্ণ, সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্ব, শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন দার্শনিক মতাদর্শের গোষ্ঠীগুলির দ্বন্দ্ব এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়গুলির লড়াই এবং মিত্রতার ইতিহাস এই ব্যাকরণ রচনার ইতিহ াসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তার "অরিজিন এ্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট অফ্ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গ ুয়েজ" বইটিতে বাংলা ভাষা ও তার বিভিন্ন রূপ বৈচিত্র্যের উৎস সন্ধানের যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তাতে অনেক অনেক তথ্য আছে। কিন্তু সমাজের ভিতরকার প্রতিদিনের সংঘর্ষ ও নির্মাণের কোনো ছবি সেখানে নেই। অর্থাৎ ভাষার জীবন্ত দিকটা এমন ভাবে উধাও হয়ে গেছে। তাই যখন নিজেকেই প্রশ্ন করি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ঠিক কবে থেকে পড়ানো ও লেখা শু হয়েছিল, তখন উত্তর খোঁজার জন্য অগ্রজদের নিকট যেতে হয় বটে তবে বুঝতে পারি ইংরেজ, বিদেশী ইউরে াপীয় আমাদের বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লিখতে শিখিয়েছে এটা একটা গভীর গাড্ডায় ফেলবার জন্য মিথ, মিথস্, যার প্রকৃত অর্থ গালগপ্প।

ব্যাকরণ সম্পর্কে আমার যতটা ধারণা জন্মেছে তার থেকে বলতে পারি বর্ণপরিচয় (যা মুখে বলা হয়, কানে শোনা হয় অ ারস্মৃতিতে রেখে দেওয়া হয়) এবং বর্ণমালা বিচার থেকেই ব্যাকরণ পাঠ, ব্যাকরণ চিন্তা শু হয়ে যায়। আমাদের বয়স্ক - চিন্তায় শিশুর বর্নোচচারণ এবং বর্ণপাঠ এবং ব্যাকরণ চিন্তা দুটি আলাদা প্রক্রিয়া --- এই ভাবনাটা চেপে বসে আছে। অথচ গুর কাছ থেকে আদ্যোচচারণ, প্রথম উচচারণ, প্রথমবার বর্ণগুলিকে শব্দ ও বাক্য থেকে আলাদা করে, বিমূর্ত করে, অধ্যাহার করে উচচারণই হলো ব্যাকরণ পাঠের প্রথম ও শেষ এবং শ্রেষ্ঠ পাঠ। তাই শব্দ ভেঙ্গে অক্ষর বের করে আনা। অক্ষরের মধ্যে বর্ণের সন্ধান করাই তো ব্যাকরণের শুয়াৎ। অবশ্য বাংলা ভাষার রূপে ইংরেজী আকারে বিশুদ্ধ সুশিক্ষকের অধ্যাহার কথাটা বুঝবেন না --তাদের কাছে, 'এ্যাবষ্ট্রাক্ট' বলতে হবে।

আর এই আদ্যোচচারণই তো সূত্রকার পাণিনি, বার্তিককার কাত্যায়ন এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এক বিশাল পরম্পরা নিয়ে আমাদের শিখিয়েছেন। তাই অবাক হয়ে ভাবতে হয় আমাদের মনের ঔপনিবেশিক দাসত্বের কথা। যে দেশে পা ণিনির ব্যাকরণ, বৈদিশ ভাষার সর্বশেষ ব্যাকরণ, যে দেশে পাণিনির সমান অজস্র ব্যাকরণ তৈরী হয়েছে, সেই দেশে, ইউরোপীয়রা এসেই ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ তৈরী করেছে, এই ভাবনাটা আমরা কিভাবে এতদিন চেতনাহীনভাবে মস্তিষ্কে বয়ে বেড়িয়েছি ভাবতে বেশ অবাক লাগে। তামিল ভাষার ব্যাকরণের দুই হাজার বছর আগের লিখিত গ্রন্থ টে াল-কাপ্পিয়ম, চোল্লা দিকরণ পাণ্ডুলিপি এখন আমরা ছাপার অক্ষরেই পাচ্ছি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংগৃহীত চর্যাপদে বাঙালী শব্দটিকে তো গঠন করতে হয়েছে, উপযুক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়েছে। অর্থাৎ শব্দগঠন ও তার অর্থ নির্দিষ্টকরণও একটি চলমান বৈয়াকরণ প্রক্রিয়া। ব্যাকরণ শব্দ তৈরী করে না; কিন্তু শিষ্ট জাতীয় ভাষা, স্ট্যাণ্ডার্ডন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ গঠন প্রক্রিয়ায় শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক, বানান বিধি, বাক্যগঠন বিধি, সর্বোপরি বৈধ শব্দ এবং অবৈধ শব্দ বা শব্দ ও অপশব্দ বোঝার ভাষাগত নির্দিষ্ট নিয়ম, যুক্তিপ্রণালী তৈরীর প্রশ্ন ব্যাকরণে আছে। এটা হুসেন শাহ বংশের সময় গোঁড়ে

বসেছে আর তার চর্চা শু হয়েছে বহু বছর আগে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। পণ্ডিত শ্রী রমেন্দ্রচন্দ্র তর্কতীর্থের মতে সমস্ত সাহিত্যই কৃত্রিম ভাষায় তৈরী, শিষ্ট ভাষায় তৈরী। আর ব্যাকরণ না হলে কৃত্রিম ভাষা, শিষ্ট ভাষা তৈরী সম্ভব নয়। তাই যারা সমাজের একেবারে উপর তলায় বসে ধারাবাহিকভাবে প্রচার করে চলেছেন যে ঊনবিংশ শতাব্দীর 'রেনেসঁাসের' পরেই বাঙালীর বিজ্ঞান চিন্তার শু হয়েছে, ব্যাকরণ চিন্তার শু হয়েছে, ব্যাকরণ লেখা শু হয়েছে,ইউরোপীয়রাই বাঙালীকে মানুষ করেছে, তার আগে সব অজ্ঞ, গণ্ডমূর্খ চিল, তাঁদের কাছে প্রশ্ন তা কাশীদাসী মহাভারত কী ভাষায় লেখা? কৃত্তিবাসী রামায়ণ কী ভাষায় লেখা? এই সাহিত্য কী, ব্যাকরণ বাদে সৃষ্টি হয়েছে? এই সাহিত্যে ব্যবহৃত বর্ণ, ছন্দ, ধবনি, অক্ষয়, শব্দ, পদ, বাক্য ব্যবহারের রীতি, উচচারণ বিধি, লিপি বিন্যাস কি জন - জীবনে সূত্রায়িত ছিল না? শব্দানুশাসন না জানলে কি এই কাজ হতে পারে?

সুধুমাত্র ব্যাকরণ নয়। ব্যাকরণ - দর্শনের উত্তরাধিকারও আমাদের আছে। যেহেতু ব্যাকরণ - দর্শন শব্দটা অনেকটাই অপরিচিত, তাই মনে হতে পারে যে দুটি আপাত সম্পর্কহীন বিষয় জোর করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিষয়টির ভিতরে প্রবেশ করলেই বোঝা যাবে যে কোনো জোর খাটিয়ে নয়, সমাজ তার নিজের প্রয়োজনেই বিষয়টির জন্ম দিয়েছে। শব্দের সঙ্গে তার অর্থের সম্পর্ক কি নিত্য সম্পর্ক, সত্য সম্পর্ক? শব্দ শ্রবণমাত্রই আমাদের মানসপটে শব্দের অর্থরূপ কি প্রকাশিত হয়? বর্ণের কি কোন অর্থ আছে? যদি থাকে তবে তার রূপ কী? আর যদি না থাকে তবে অর্থহীন শব্দ থেকে অর্থযুক্ত শব্দ দৈরী হয় কী করে? এসকল অসমাধিত প্রশ্নই আলোচিত হয়েছে ব্যাকরণ - দর্শনে। প্রবহমান দুনিয়ায় প্রতিনিয়ত আমাদের নতুন নদুন ঘটনাপ্রবাহ ও বস্তুকে সংজ্ঞায়িত করতে হচ্ছে, নামকরণ করতে হচ্ছে, নির্দিষ্ট অর্থ সীমায়িত করতে হচ্ছে। যেমন --- রেনেসাঁস, রকেট, ক্লোনিং, সন্ত্রাসবাদ, জিনপুল, মসালাধোসা, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, ব্ল্যাক ক্যাট, ব্ল্যাকবক্স, আত্মঘাতীবাহিনী ইত্যাদি। অর্থাৎ নতুন বস্তু, পণ্য, প্রযুক্তি, পদ্ধতি ভাষার বহিরঙ্গের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, নতুন পরিভাষা তৈরী করছে, নতুন ভাষা চিন্তার জন্ম দিচ্ছে। এই প্রবাহকেই যখন বিভিন্ন মতাদর্শের দার্শনিকগোষ্ঠী ব্যাখ্যা করে তখন দরকার পড়ে নতুন ধরনের কৃত্রিম ভাষার এবং ব্যাকরণের। এই ধরনের গোষ্ঠীর ব্যাকরণের নেপথ্যে থাকে একটা দর্শন, একটা মতাদর্শ। যেমন রামমোহন রায়ের গৌড়ীয় ব্যাকরণ, বৈষ্ণবদের শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীজীব গোস্বামীর হরিনামামৃত ব্যাকরণ বা যুক্তরাষ্ট্রের খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচার সংগঠনের 'খিলজী' বক্তিয়ার, ক্লিসনের ডেসক্রিপটিভ্ লিঙ্গুইস্টিক্স। প্রাচীন ভারতে ব্যাকরণচর্চায় ব্যাকরণকেস্মৃতি ও দর্শন হিসাবে দেখা হতো। কিন্তু আধুনিক বাংলা ব্যাকরণগুলোতে ব্যাকরণ দর্শনের ব্যাখ্যা, বিতর্ক বা অনুশীলন একেবারেই নেই, বরং ইউরোপীয় ভাষার সঙ্কীর্ণ, সঙ্কুচিত ব্যাকরণশৈলী প্রয়োগ করতে গিয়ে পরম্পরাগত বর্ণচিন্তা থেকে সরে ভাষার শক্তি সম্ভাবনা, উর্বরতা, বপন ক্ষমতা কমিয়ে ফেলা হয়েছে। এটাও একটা ভাষাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ঔপনিবেশিক কৌশল। এই ঔপনিবেশিক ধারার উত্তরসূরিরা বাংলা ভাষার লিপ্যক্ষর নিয়ে জটিল আলোচনায় যেতে চায় না, বরং লিপ্যক্ষরকে 'বর্ণ' বলে চালিয়ে ইতিহাসকে চেপে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বকলমে বিল গেট্স্দের আনার চেষ্টা করেছেন।

বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে বাংলা লিপ্যক্ষরগুলোর চেহারা, ছবি, বিন্দু, রেখায়, বৃত্ত, অর্ধবৃত্তে বর্ণিত হয়েছে। লোকায়ত দর্শন হিসাবে 'তন্ত্র' সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর দান। 'তান্ত্রিক গোষ্ঠী' তাদের বীজমন্ত্র দর্শনের কাঠামো তৈরীর কারণেই বর্ণচিন্তা, লিপি চিন্তা করেছেন। সেই বর্ণচিন্তার কোনো স্বীকৃতিই থাকে না যদি আমরা ধরে নি বাঙালীর ব্যাকরণ তৈরী করেছে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ, তৈরী করেছে কেরী সাহেবের মুন্সি। চৈতন্যের বহু পূর্ব থেকে বাংলা, মৈথিলী, অহমিয়া লিপিতে কাব্য, গদ্য, চিঠি - পত্র, শিলা - লিপি সবই পাওয়া যাচ্ছে। উড়িষ্যা, বাংলা, আসাম সমস্ত প্রদেশেই সংস্কৃত ও নিজ ভাষায় নিজেদের চিন্তা, ধর্ম ও দর্শন প্রকাশিত হয়েছে। 'অপরে কা কথা' --- স্বয়ং পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে এবং স্বয়ং গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রে, এত সরল ও সুবোধ সংস্কৃত রচনা করেছেন যার তুলনা নেই।এই সরলীকরণের প্রক্রিয়া সামাজিক প্রয়োজনেই সংগঠিত হয়েছিল। এর পূর্বে ধর্মপ্রচারকর সাধারণ সংস্কৃতে ও ধর্মীয় শিষ্ট সংস্কৃতে গ্রামে গ্রামে ধর্ম প্রচার করে বেড়াতেন। তাঁদের মধ্যে বৌদ্ধ এবং জৈনরা অগ্রগণ্য। তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হলে লোকভাষিত, লোকব্যবহৃত সরল প্রাকৃত প্রায় সংস্কৃত ছাড়া উপায় ছিল না। বিশেষ করে ইসলাম আসার পরে এই প্রক্রিয়া এত ব্যাপক হয়েছিল যে বহু পুঁথির ভাষাও সহজিয়া সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষা হয়ে গেছিল। প্রাকৃতভাষার ব্যাকরণ রচনার ইতিহাসও তাই বাংলা ব্যাকরণের পূর্বপদক্ষেপ বা সলতে পাকানো বলে, সমান্তরাল চর্চা বলে ভাবতে হবে। বাংলার বিভিন্ন উপভাষাগুলোকে নিয়ে শিষ্টভ

াষা নির্মাণের কাজ শশাঙ্কের সময়ই শু হয়েছিল। তাই ইসলামী দলিলে 'বাঙ্গালা' শব্দটা স্থান ও ভাষা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অতি প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানের 'বে-অফ বেঙ্গল 'বঙ্গোপসাগর' নামে পরিচিত। আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্য চরিতামৃত'তে পাচ্ছি চৈতন্যদেবের হাতেখড়ি অনুষ্ঠানের বর্ণনা ঃ----

''কত দিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল।
অল্প দিনে দ্বাদশ ফলা অক্ষর শিখিল।''

এই দ্বাদশ ফলা অক্ষর শিক্ষা বর্ণ ও লিপি শিক্ষার একটি শেষ পাঠ। জগন্নাথ মিশ্র নিশ্চয়ই একটি লিখিত বাংলা ব্যাকরণ শিখিয়েছিলেন, কারণ নাগরী লিপির বিন্যাসে 'ফলা' আকরে অক্ষর - শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত নয়।

এক্ষেত্রে রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত 'ব্যাপ্তিপঞ্চক' গ্রন্থের ভূমিকায় রঘুনাথ চরিত অংশে ন্যায়াচার্য রঘুনাথ শিরোমণি সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকাটি বিবৃত করেছেন তা প্রাসঙ্গিক --- ''বাসুদেবের যত্নে রঘুনাথের বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ হইল। বাসুদেব রঘুনাথকে অ, আ, ক, খ, গ, ঘ পড়াইলেন

রঘুনাথ গুমুখে একবার শুনিয়াই তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন, এবং একটু পরেই জিজ্ঞাসা করিলেন 'গুদেব! দুইটি 'জ'' কেন? তিনটি ''শ'' কেন? ''ক''অ - এর পরে ''খ'' কেন? ''ক'' কেন আগে?

''বাসুদেব, বালকের প্রশ্ন শুনিয়া অবাক, তিনি কৌতূহল পরবশ হইয়া সহজে রঘুনাথকে তন্ত্র ও ব্যাকরণের কথা বলিয়া বুঝাইয়া দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় রঘুনাথও তা ধারণ করিলেন।''

রঘুনাথ শিরোমণির ব্যাকরণ জ্ঞানের আরও একটি নিদর্শন হলো তার নিম্নলিখিত কবিতাটি--

''পঠন্ত কতিচিদ্ধঠাৎ খ-ফ-ছ-ঠেতি বর্ণাঞ্ছঠা,
ঘটঃ পট ইতীতরে পটুরটন্ত বাক্পাটবাৎ।
বয়ং বকুল - মঞ্জরী - গলদ - মন্দমাধবী ঝারী
ধূরীন - পদ - রীতিভির্ভণিতিভিঃ প্রমোদামহে।''

অর্থাৎ, বৈয়াকরণগণ খ-ফ-ছ-ঠ-থ ইত্যাদি পড়ে পড়ুক, বাক্পটু নৈয়ায়িক কেবল ঘট-পট করে কক, আমরা নৈয়ায়িক হইয়াও বকুল মঞ্জরীর মধুরূপ সুরা প্রস্রবণ স্বরূপ পদ লইয়া সর্বদা মত্ত থাকি।

বস্তুত মাতৃভাষার ব্যাকরণ লেখার চলন ভারতবর্ষে আদিযুগ থেকেই আছে এবং সেখানে বর্ণ ও ধবনি চিন্তা সমস্ত ব্যাকরণেরআদি উপজীব্য। ইংরেজ তো সেদিন তার ভাষার ব্যাকরণ লিখতে শিখল, সেই ষোড়শ শতাব্দী বা তার আগে সবই লাতিন বা গ্রীক। বহু জৈন, বৌদ্ধ বৈয়াকরণ প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ লিখে গেছেন। তামিল ও দ্রাবিড় ভাষার ব্যাকরণও অতি প্রাচীন। প্রাচীন কালেই বেদকে ঋক্, সাম, যজু এবং অথর্ব নামে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক বেদের উচচারণ অনুযায়ী অনেকগুলি শাখা আছে। এগুলিকেচরণও বলা হয়। প্রতিশাখায় বেদের উচচারণ বিষয়ে তত্ত্ব ও তথ্য সংকলিত হয়েছিল। এগুলি বেদের প্রতিশাখায় আছে বলে বর্ণের উচচারণের এই তত্ত্বও তথ্যগুলিকে একত্রে প্রাতিশাখ্য বলে। ঋক্ প্রাতিশাখ্যে দেখা যায় যে বাংলা বা অন্য ভারতীয় ভাষা, যেগুলির লিখিতরূপ বহুযুগ ধরে বিদ্যমান, তাদের মধ্যে ঋক্ প্রাতিশাখ্যের বর্ণ উচচারণ, বর্ণমালা ও বর্ণত্রতেমর আদলটাই প্রধান, অর্থাৎ বাংলা সম্প্রসারিত বর্ণমালা শুধুমাত্র 'বাংলাভাষা'র ধারক নয়, অন্য ভারতীয় ভাষা ও বিশ্বের ভাষার ধারণ ক্ষমতাও এই বর্ণমালার আছে। বাংলা ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞান করতে চাইলে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন একটি শক্তিশালী সম্প্রসারিত বর্ণমালা, যা বিদেশী ভাষার ধবনিকে অনায়াসে প্রকাশ করতে পারে। একথা চিন্তা না করে শুধুই সরলীকরণের ভাবনায় সংকুচিত বর্ণমালা তৈরী করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ইতিহাসবিচ্ছিন্ন, পরম্পরা বিচ্ছিন্ন এক শিকড়হীন জাতি গঠন করবে। বহুজাতিক নির্দেশে বাংলাভাষার ''কী - বোর্ড'' তৈরীর কারণে এই সরলীকরণ নতুন করে ভাষা চিন্তাকে পরাধীন করবে। সরলীকরণের সোজাপথ এতই কুসুমাস্তীর্ণ যে বানানের সংজ্ঞাটাও বদলে ইংরাজী ভাষার 'স্পেলিং' -এর বিকল্প করা হয়েছে। এখন বানান অর্থ করার হয়েছে শুধু বর্ণগুলোকে বলা । আসলে যে তা নয়, বানান মানে 'অক্ষরবিচার', শব্দকে ধবনি অনুযায়ী অক্ষরে অক্ষরে ভাগ করা এবং সেই অনুযায়ী লেখা এ কথা ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাই এক বিশেষ সংবাদপত্র 'সর্দার'কে লেখে 'সরদার'।

যাই হোক আবার একটু পুরোনো কথা বলি। 'পাণিনীয় শিক্ষা' গ্রন্থে প্রথমেই বলা হয়েছে সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে ৬৪ টি বর্ণ।

পাণিনি থেকে শু করে বহু সংস্কৃত বৈয়াকরণ স্থান ও অঞ্চল ভেদে সংস্কৃত উচচারণ করার অধিকার দিয়ে গেছেন। পঞ্চবর্গ স্পর্শ ব্যঞ্জন বর্ণমালা, ভারতের সর্বত্র। এই কারণেই বাঙালীর 'অ' উচচারণ এবং পাশ্চাত্য ভারতের 'অ' উচচারণের মধ্যে অনেক তফাৎ। অষ্টাধ্যায়ীর শেষ সূত্রে এই বিষয় পরিষ্কার উল্লেখ করে গেছেন পাণিনি। ফলে স্থান, কাল ভেদে বিভিন্ন ভ ারতীয় ভাষার বর্ণচিন্তা এবং ধবনি চিদন্তায় বিবার - সংবার -শ্বাস - নাদ - ঘোষ - অঘোষ, স্পৃষ্ট, অস্পৃষ্ট, অর্ধস্পৃষ্ট, অনুপ্রদান, স্থানকরণ, প্রভৃতি মেটাল্যাঙ্গুয়েজ বা পরিবাষার চিন্তা আছে। যেমন স্তরের হ্রস্বতা ও দীর্ঘতার চিন্তা আছে, তেমন ব্যঞ্জনের হ্রস্ব দীর্ঘতার চিন্তাও আছে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতের, অক্ষরচিন্তায় বর্ণ ও অক্ষরের সমাপতন, অক্ষর াঙ্গ, স্বরাক্ষর, মাত্রাক্ষর, ছন্দাক্ষর ইত্যাদির চিন্তা আছে। বাঙালী বৈয়াকরণ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ব্যাকরণে 'সমান অক্ষরের' ভাবনাটাও পেলাম। তিনি বলেছেন "দুই স্বরের মধ্যে কেবলমাত্র মাত্রার ও উচচারণ কালের ভিন্নতা থাকলে ত ারা সমান, অন্যথায় অসমান।" পাণিনি সূত্রানুয়ায়ী এটাই 'তুল্যাস্য প্রযত্নম্ সবর্ণম্"। এই সকল বিষয়ে বাঙালীর ধবনি চিন্তা ড্যানিয়েল জোনস্ এবং গ্লিসনের উপরে চলে গেছে। জ্যাকবশন, ত্রবেত্স্কয় প্রভৃতি শ ধবনিতত্ত্ববিদরা এবং পরবর্তী বহুভাষাতত্ত্ববিদ, ইংরাজী আদলে যে তথাকথিত "অগ্রগামী আধুনিক ভাষাতত্ত্ব" তৈরী করেছেন আমাদের দেশের সাম্র াজ্যবাদী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ভিত্তিতে বড় হওয়া শিক্ষাবিদদের এইগুলোর শক্তি বোঝা কঠিন। ফার্দিনান্দ দে সস্যুরের পঁ াচ পৃষ্ঠার এক্সার্সাইজ খাতায় ছাপিত রূপ না দেখেই লক্ষ পাতা লক্ষ পাতা করে যাচেছন। হাজার হাজার পৃষ্ঠা ভ ারতীয় ব্যাকরণ চিন্তার নির্বর্ণ ও নিরক্ষর থেকেই।

বাংলা ভাষার যুক্তাক্ষরগুলির উপর নীচে করে লেখার বৈশিষ্ট্য, প্রাচীন হরপ্পা - মহেঞ্জদরো এবং মিশরীয় সভ্যতার লিপির বৈশিষ্ট্য, সেমেটিক লিপির বৈশিষ্ট্য। সেমেটির লিপি থেকে গ্রীক লাতিন ও ইউরোপীয় লিপি এসেছে। উর্দু বাদে বাংলা ও ভারতীয় লিপিতে শব্দের মাঝখানে 'অ' লেখা হয় না। কল / ক্ল - ক এর পরে ল বসলেন মাঝখানে 'অ' আছে; আমরা সব াই পড়ব 'কল' (কলকাকলী শব্দে কল এর)। অর্থাৎ (ক্ /অ/ল)। কিন্তু ক এর নীচে ল থাকলে বা 'প' এর নীচে 'ত' থাকলে মাঝখানে 'অ' নেই। অর্থাৎ প্লাবন,আপ্ত। এই কারণেই আমরা 'ফলা' বলি, বলি পয়তয়ান্ত। কাজেই সংযোগবর্ণ বা যুক্ত াক্ষরগুলি এক একটি অক্ষর। এই কথাটি বাঙালী ও সমস্ত ভারতীয় ভাষা - ভাষীর মাথায় ও কানে শোনায় স্বতঃস্ফূর্ত ভ াবেই রয়ে গেছে। রঞ্জ্ ধাতু যোগ ক্ত করেই রক্ত --- রক্/ ত করে বানানো নয়। এক্ষেত্রে পাণিণির একটি সূত্র আছে। যেটি আদিকালে শিশু শিক্ষার্থীও জানতেন। বর্তমানে যারা ভাষা সংক্রান্ত নিয়ম কানুন তৈরীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তাঁরাও এটি নিশ্চ য়ই জানেন। হয়তো প্রয়োগ জানেন না, যত্ন করে এড়িয়ে যান। আর যদি না জানেন তবে অজ্ঞতা স্বীকার করা ভাল। সূত্রটি হল "হলো হনন্তরা সংযোগঃ (১/১/৭) এর বৃত্তি হলো পরপর দুটি হল্ বা ব্যঞ্জন এলে তাকে 'সংযোগ বলে --- তাকেই বলি যুক্তাক্ষর।

ব্রাহ্মীলিপি ও প্রাকৃত ভাষাগুলির 'ধবনি, ধবনিতত্ত্ব ও ধবনিম" তত্ত্বের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধগুলি ভালো করে আলোচনা করলে বোঝা যাবে এই ধারা কিরূপ খর ভাবে আমাদের ভাষা ও লিপিতন্ত্র চিন্তার ও ব্যবহারে বর্তমান। তাকে কাটতে যাওয়া অর্থ আমাদের কবন্ধ করা।

"হাঁস ছিল সজা (ব্যাকরণ মানি না)
হয়ে গেল হাঁসজা কেমনে তা জানি না।"

---এই পংক্তি কয়টি আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। এটি পড়ে ছোটরা খুব মজা পেলেও বড়রা চিন্তায় পড়েন -- সত্যি কি ব্যাকরণণ না মানলে 'হাঁসজা' হয়ে যায় বা হবার সম্ভবনা থাকে? ---এ প্রশ্নের উত্তর কম বেশী আমরা জানলেও সবচেয়ে ভ াল জানেন বোধ হয় হ য ব র ল -এর ব্যাকরণ সিং মিস্টার গ্রামার --- বি - এ মানে যাদের কাছে ব্যা। সে যাই হোক বিষয়টা ব্যাকরণ নিয়েই। তবে মূল আলোচনাটা শুর আগে আবার প্রাতিশাখ্য কথাটা নিয়ে আগেই আলোচনা করা য াক। কথাটা, শব্দটা এসেছে প্রতিশাখা কথাটা থেকে। প্রত্যেক বেদের উচচারণ অনুয়ায়ী অনেকগুলি শাখা ছিল। এগুলিকে চরণও বলা হয়। প্রতি শাখায় বেদের উচচারণ বিষয়ে তত্ত্ব ও তথ্য সংকলিত হয়েছিল। এগুলি বেদের প্রতিশাখায় আছে বলে বর্ণের উচচারণের এই তত্ত্ব ও তথ্যগুলিকে একত্রে প্রাতিশাখ্য বলে। প্রাতিশাখ্যগুলি রচনা,, মানক করা ও অক্ষুণ্ণ রাখ ার ভার ছিল পর্ষদ সংগঠনগুলির উপর। সব প্রাতিশাখ্য আমরা পাইনি। তবে তার মধ্যে আমরা পাণিনি স্মরণ - উৎসব সমিতিকে ঋক্ প্রাতিশাখ্য পূর্ণাঙ্গভাবে পেয়েছি। তাতে একটা বিষয় দেখলাম যে বাংলা বা অন্য যে কোনো ভারতীয় ভাষা

যেগুলির লিখিত রূপ বহুযুগ ধরে বিদ্যমান তাদের মধ্যে ঋক্ প্রাতিশাখ্যের বর্ণ উচ্চারণ, বর্ণমালা ও বর্ণক্রমের আদলটাই স্পষ্ট। দ্বিতীয়তঃ অপর একটা শব্দ মেটাল্যাঙ্গুয়েজ বা কৃত্রিম ভাষা বা পরিভাষা একটু বুঝিয়ে বলা যাক। সহজ কথায়, যে কৃত্রিম বা যদৃচ্ছ ভাষার সাহায্যে কোনো ভাষার ব্যাকরণ বা সূত্র পাঠ, শব্দানুশাসন বা গ্রামার লেখা হয় তাকেই মেটাল্যাঙ্গুয়েজ বা পরিভাষা বলে। সূত্রকার পাণিনির ব্যাকরণ বর্ণনায় ভাষার সাহায্যে কোনো ভাষার সূত্রভাষা এরকম মেটাল্যাঙ্গুগয়েজ। দুই একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। ধরা যাক ইংরাজী ভাষার একটা ব্যাকরণ বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে। তখন ইংরাজী ভাষাটা হবে অবজেক্ট্ ল্যাঙ্গুয়েজ বা বস্তুভাষা আর বাংলা ভাষাটা হবে মেটা - ল্যাঙ্গুয়েজ বা বর্ণনার ভাষা। যদিও ব্যাকরণই কণ আর বিজ্ঞানই কন, কিছু কৃত্রিম শব্দ, যেমন -- প্রকৃতি, প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস, উপসর্গ, অনুসর্গ, নিউক্লিয়াস, বেগ, ত্বরণ, ভেক্টর, অণ্, অচ্, অক্, এফ -- ১৬, এ. কো - ৪৭, ফিসন, ফিউসন্, গ্লোবাল াইজেসন ইত্যাদি তৈরী করতেই হয়। না হলে কোনো কিছুই ঠিক ঠিক প্রকাশিত করা যায় না বা কিছু নতুন কথা বলছি এমন ভাব আনা যায় না। তবে সেই ভাষার অর্থ সাধারণ মানুষের কাছে অর্থবোধক নাও হতে পারে বা এর জাতিভেদী ও অর্থভেদী অনর্থকারী অনর্থকত্ব আস্তে আস্তে প্রকাশিত হতে পারে। এ এক ধরনের কোড ল্যাঙ্গুয়েজও বটে।

এবার মূল আলোচনা শু করা যাক। ভারতবর্ষের ব্যাকরণ চর্চা এবং ব্যাকরণ সম্বন্ধিত চিন্তা অত্যন্ত প্রাচীন। এটা পাণিনি চর্চা করতে গিয়ে আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু লিখিত বাংলা ব্যাকরণ আমরা সেই তুলনায় কম পাই বলে প্রচার আছে। অ াসলে সে পুঁথিগুলোই বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। এ থেকে অনেকে যা অনুমান করে জোর গলায় চেঁচান যে ইউরে াপীয়দের ভারতে আগমনের পূর্বে বাংলীয় কোনো ব্যাকরণ লেখা হয়নি বা বাংলা শিক্ষণের জন্য কোনো ব্যাকরণ ছিল ন া। এই সুপ্রচলিত ধারণাটি আমার মনে আজ বিশ্রীভাবে ধাক্কা দিচ্ছে। কারণ যেদিন থেকে বাংলা ভাষা আছে এবং শিষ্ট জ াতীয় ভাষার লিখিত রূপ আছে সেদিন থেকেই বাংলা ব্যাকরণও আছে। বোধ হয় খুঁজলে এখনও কিছু পাণ্ডুলিপি পাওয় া যেতে পারে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত তো শ্রুত নয়, লিখিত। তবে কি তার ব্যাকরণ, কি তার ব্যবহৃত ভাষার বর্ণ, ধবনি, কি তার উচ্চারণ বিধি, কি তার লিপি বিন্যাস, শব্দ পদ বাক্য ব্যবহারের রীতি, নিয়ম, সূত্র জ ানা ছিল না, জানা নেই। শব্দানুশাসন না জানলে, না লেখা হলে এ সাহিত্য তৈরী হতে পারে না। তাই আমরা বুঝতে প ারছি।

তবে আধুনিক যুগে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় সব ব্যাকরণগুলির মধ্যে পাঠক গবেষক ও কিছু ছাত্রছাত্রীর কাছে ১৮২০ স ালের রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' খুবই জনপ্রিয় বা পরিচিত নাম। জাতীয় জীবনে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার প্রভাব এক্ষেত্রে মনোযোগ আকর্ষণের একটা কারণ। কিন্তু কতজন সেটাই পড়েছেন? তবে সেই তুলনায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ব াংলা ব্যাকরণটির কথা অনেকেই জানেন না। এটি আনুমানিক ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে লেখা হয়। বহুদিন পাণ্ডুলিপি আকারে থাক ার পর মাত্র কয়েক বছর আগে ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে এটিকে ছাপিয়ে প্রকাশ করেন শ্রী তারাপদ মুখোপাধ্যায়। যে কোনো ভাষা শিখতে গেলে তার ধবনি বিজ্ঞান বা ধবনিম অথবা বর্ণ বিচার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এই বইটিতে এই প্রয়োজন বিশেষ করে ভাষা শিক্ষণে বেশ ভালই চর্চিত হয়েছে। তবে এই ব্যাকরণটি থেকেই বোঝায় যে এর পূর্বে শত শত ব্য াকরণের রূপ প্রতিশাখ্য অনুযায়ী লেখা হয়েছে। প্রাতিশাখ্যের বর্ণ পরিচয়ের রীতিই এখানে বেশী অনুসৃত হয়েছে। পাণিনি সূত্রের ব্যবহার প্রত্যক্ষভাবে খুবই কম। তবে আমি এই আলোচনায় শুধু মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কৃত ব্যাকরণের উচ্চারণ - মূলকতার প্রাথমিক দিকটাই তুলে ধরছি। এই উচ্চারণ তত্ত্বে যে সমস্ত মেটা - ল্যাঙ্গুয়েজ উনি ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে রয়েছে অক্ষর, স্বর, ব্যঞ্জন, বিসর্গন্ত - স্বর, কার, বর্গ, বর্ণ --- অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, সানুনাসিক, হ্রস্ব ও দীর্ঘ, সমান ও অসম ান। হল্, কণ্ঠ্য, তালব্য ইত্যাদি। সংযোগ, ফল, রেফ্ আর প ফলা--- বর্ণের বিশেষ কতগুলি রূপ। তবে 'সমান অক্ষর' কথাটার পাণিনি পন্থায় পর্যায়শব্দ সবর্ণ। পাণিনির একটি সূত্র আছে 'তুল্যাস্য প্রযত্নম্ সবর্ণম,' প্রথমটা পাণিনীয় নয়, প্রা তিশাখ্যের। এই বইটিতে বলা হলো বাঙ্গালা পঞ্চাশ অক্ষর। এর মধ্যে ঘোল স্বর চৌত্রিশ ব্যঞ্জন। তার মধ্যে অ কারাদি বিসর্গান্ত স্বর, ক কারাদি 'ক্ষ' কারান্ত ব্যঞ্জন অর্থাৎ এই বই অনুযায়ী বাংলা বর্ণমালা অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ অং অঃ । ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ।

আজকের বাংলা বর্ণমালা কি ঠিক এরকমই আছে? যদি না থাকে তবে কি কি পরিবর্তন হলো, কেন হলো আমাদের ভ াবতেহবে। তবে এ থেকে বোঝা যায় বাংলা বর্ণমালা চিরকাল একভাবে ছিল না। এই বইতে স্বরের চিহ্ন া, ি, ী, ু, ূ, ে, ৈ, ো,

ৗ এর যে রূপগুলি লিখিত আকারে ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়ে সেগুলির আলোচনা করা হয়েছে। যেমন কা, কি, কী, কু, কূ ইত্যাদি। এছাড়াও ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জন বর্ণে এমনভাবে যুক্ত হয় যেখানে স্বর থাকে না। যেমন ক্র, খ্ন, প্ল, ঘ্ন ইত্যাদি। এরূপ ঘটনা বা ফেনমেননকে তি 'সংযোগ' বলেছেন। ১১টি সংযোগের উল্লেখ করেছেন। এগুলিকে আমরা এখন যুক্তাক্ষর বলে থাকি। যদিও যুক্তাক্ষরের লিখিত রূপটাই জেনে থাকি। আসলে যুক্তাক্ষর একটি ধবনিগত ও অর্থগত ঘটনা। এই বইতে আরও বলা হয়েছে যে সন্ধিদুই প্রকার। স্বরসন্ধি। তার মধ্যে 'স্বরসন্ধিতে' সমান 'অচ্' মিলিয়া দীর্ঘ হয়। উদাহরণ 'মসারি' অর্থা? মস্ + অ + অরি। দুটি 'অ' যুক্ত হয়ে, সংহিতা হয়ে অ হয়েছে। 'অচ্'--- এটি একটি প্রত্যাহার । (অ থেকে ঔ সকল স্ব বরগুলি বোঝায়) এটি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রের পাঠের মেটাল্যাঙ্গুয়েজ, ব্যাকরণ বোঝার ভাষায় মধ্যে পাই। এই বইতে আরো বলা হয়েছে অ-কারের ও - কারের পর যদি এচ্ (এ ঐ ও ঔ) হয় তবে তার 'বৃদ্ধি' হয়। উদাহরণ পরমের পরম্ অ ঈশ্বর। অর্থাৎথ অ ঈ মিলিয়ে --- 'এ' হয়েছে, স্বরের বৃদ্ধি হয়েছে। সূত্রকার পাণিনি বলছেন 'বৃদ্ধিরাদৈচ্'। অর্থাৎ (আ, ঐ ও) কে বৃদ্ধি বলা হবে। সুতরাং বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের পাণিনি সূত্রগুলিকে অনুসরণ করার প্রচেষ্টা ছিল। যদিও তা সম্পূর্ণত া পায়নি।

শেষ যে বিষয়টির অবতারণা করব আগে বলেছিলাম তা হলো ব্যাকরণ - দর্শন। অনেকের কাছে মনে হতেই পারে যে দুটি আপাত সম্পর্কহীন দুটো বিষয় জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বিষয়টির একটু গভীরে প্রবেশ করলেই বোঝা যাবে যে এটি কে ানো জোর খাটিয়ে তৈরী নয়। যদি বিষয়টা এভাবে বোঝার চেষ্টা করি যে সমাজে যত নতুন বস্তু, পণ্য, প্রযুক্তি, বিষয়ের উদ্ভব হচ্ছে, সবটাকেই আমাদের কোনো না কোনো নাম দিতে হচ্ছে, যেমন --- রেনেসাঁস, রকেট, সেলুলার ফোন, দূরবীন, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, জেনেটিক্ ইঞ্জিনিয়ারিং, জিন পুল, চিলিচিকেন, মসালা ধোসা, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি। অর্থ াৎ বস্তুর, ঘটনা প্রবাহ ও তার পরিবর্তনই ভাষার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, ভাষা তৈরী করছে, ভাষাচিন্তার জন্ম দিচ্ছে ভাষায় লক্ষ শব্দে আবার শব্দেরা 'দীর্ঘ সত্রবৎ' ফিরে ফিরে অসাছে। এই বোধ থেকেই বলা যায় যে বাইরের বস্তু যেমন মানব মস্তিষ্ককে চিন্তা করাই, তেমনই মানবচিন্তার বহিঃপ্রকাশই ভাষা, মানব ভাষা; শেষ বিচারে চিন্তাই ভাষা, তাই ভাষাচিন্তা ও কর্মই মানবের দর্শন, বিজ্ঞান ও ব্যাকরণ।

সংস্কৃত ব্যাকরণ চর্চায় ব্যাকরণকে স্মৃতি ও দর্শন হিসাবে দেখা হতো। কিন্তু আধুনিক ব্যাকরণগুলোতে বা বাংলা ভাষার ব্য াকরণগুলোতে ব্যাকরণ দর্শনের চর্চা একেবারেই কম।

কিন্তু আজকের ভাষাতত্ত্বে কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্যে ব্যাকরণের দর্শনের চিন্তা প্রবল হয়ে উঠছে। আমেরিকান ভাষাতত্ত্ববিদ, নোয়াম চম্স্কি বা নাউম্ ক্ষ্মা, যিনি সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন, তিনি একটি বই লিখেছেন 'কার্তেসীয়ান লিঙ্গু- ইস্টিক্স'। দেকার্তকেআমরা পাই দার্শনিক গণিতজ্ঞ হিসাবে। তাঁর ভাবনাকে ভাষাতত্ত্বে প্রয়োগ করা হয়েছে। শুনেছি এ ফরাসী গণিতবিদ দার্শনিক দেকার্তে বলেছিলেন 'কজিত এর্গো সুম্' -- চিন্তা করি অর্থাৎ আমি আছি। আমার অস্তিত্ব, ম ানবের অস্তিত্ব চিন্তা - নির্ভর। বাতাস জল খাদ্যের উপর যেমন মানব অস্তিত্ব নির্ভরশীল, ভাষার উপরও নির্ভর শীল, ব্য াকরণের উপরে তো বটেই। যা যেমন মাথার ভেতরে তেমনি বাইরে।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ব্যাকরণ কেন শিখব, কেন লিখব তার অনেকগুলি কারণ নির্ণয় করেছিলেন। তার মধ্যে, কথাটা শুধুপতঞ্জলির নয়, তবে আগের কাত্যায়নের --- রক্ষা, উহ্ আগম, লঘু অসন্দেহ --- এই পাঁচ কারণে ব্যাকরণ আবিষ্কার করব। পুস্তকে স্ফুট করব। ভাষা রক্ষা, সম্পত্তি রক্ষা, দেশ রক্ষা এবং জাতি রক্ষাও যুক্ত, যুক্ত সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী ল গ্নীপুঁজি থেকে দেশী লগ্নীপুঁজিকে রক্ষা। তবে আমাদের বাংলা ভাষায় আধুনিক বৈয়াকরণরা যদি ব্যাকরণকে ভাষা - বিজ্ঞ ানের দৃষ্টিতে, ভাষা - দর্শনের দৃষ্টিতে বিচার করেন তবে নিশ্চয়ই আমরা বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার ত্রিমুনি ব্যাকরণের ভ াবনায় বাংলা ভাষার শিব - শূত্র লিখতে পারব।

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ কি নিত্য সম্বন্ধ না চিরকালীন অনিত্য সম্বন্ধ? পরিবর্তনশীল সম্বন্ধ? এই বিষয়টি অতি প্রাচীন কাল থেকেই বিতর্কিত। 'গ' শব্দটি চিরকালই ঐ প্রাণীটিকে প্রকাশ করছে, কিম্বা করছেন না --- এটা নিয়েও ব্যাকরণ - দর্শনে অনেক পরস্পরবিরোধী ভাবনা আছে। বর্ণদের কি অর্থ আছে? যদি থাকে, তবে বাংলা বর্ণগুলির কোন্টির কি অর্থ আমর া কি জানি? আর যদি নাথাকে, তবে এক বর্ণের শব্দগুলির অর্থ পাই কি করে? এই বিষয়গুলি আমাদের বাংলা ব্য াকরণগুলিতে আলোচিত হয় নি। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ক্ষুদ্র ব্যাকরণে এ বিষয়গুলি নেই, এবং পরবর্তীকালের কোনো ব

াংলা ব্যাকরণেই এই ভাবনা দেখা যায় নি। যদিও এই আলোচনা শুধু মাত্রই 'কিছু অন্যভাবে চিন্তা করা যায় কিনা' এই ভ াবনারই শুয়াৎ, তবু যে - ভাবনাই কণ না কেন, আসুন সুত্রকার পাণিনি, বার্তিককার কাত্যায়ন ও মহাভাষ্যকার পতঞ্জ লির আলোকে নতুন চিন্তাকণার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আবার আমাদের বর্ণপরিচয় ঘটাই।

আমি উপসংহারে যাওয়ার আগে আর একটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করব --- সেটা হলো এই বর্ণ পরিচয়ে এবং বর্ণমালা বিচার থেকে ব্যাকরণ পাঠ, ব্যাকরণ চিন্তা শু হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের বয়স্ক চিন্তায়, শিশুর বর্ণোচচারণ এবং বর্ণপাঠ এবং ব্যাকরণ চিন্তা যেন দুটি আলাদা আলাদা প্রক্রিয়া -- এই ভাবনাটা গেঁড়ে বসেছে। অথচ গুর কাছ থেকে আদ্যোচচারণ, প্রথম উচচারণ, প্রথম বর্ণগুলির শব্দ ও বাক্য থেকে আলাদা করে বিমূর্ত করে উচচারণই হলো ব্যাকরণ পাঠের প্রথম ও শেষ এবং শ্রেষ্ঠপাঠ। সেই জন্য আবার এই আদ্যোচচারণে পাণিনি, বার্তিককার কাত্যায়ন এবং মহাভাষ্যকার, চূর্ণীভাষ্যক ার, ফণীভাষ্যকার পতঞ্জলিই সর্বশ্রেষ্ঠ। আরো একটি কথা। যুগোস্লাভিয়ার সার্বোখর্বাতীয় ভাষার বা সার্বোক্রোয়াশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাকরণ লেখার একটি হিসাবে দেখা যায় যে তাদের এপর্যন্ত ৭৫০টি ব্যাকরণ লেখা হয়েছে। আর যেখানে কম করে বিশ কোটি লোকের ভাষা যা পৃথিবীর তৃতীয় বা চতুর্থ ভাষা বাংংলা সেখানে বিখ্যাত ও অখ্যাত সব বাংলা ব্য াকরণগুলিকেই, যার মধ্যে স্কুল পাঠ্য ব্যাকরণকেও ধরছি, হিসাবের মধ্যে এনেও দেখতে পাচ্ছি, হাতে গুণতে পারা যায় এমন কয়েকটি মাত্রই ব্যাকরণ লেখা হয়েছে বলে মনে হয়। কাজেই যে যত যেভাবে পারে ব্যাকরণ লিখুক, সহস্র ব্যাকরণ বিকশিত হোক। ব্যাকরণপাঠ ও চর্চা বাংলা সাহিত্যের পাঠ ও চর্চার মতোই প্রচলিত হোক। আজও কোনো এক মূর্খ 'দেরিদা'র কাছ থেকে আমাদের শুনতে হয় পাণিনি ব্যাকরণ লিখে ভাষার গতিস্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। প্রাচীনরা ভাল করেই জানতেন বানানকরা অর্থ অক্ষর ভেঙে ভেঙে শব্দ আলোচনা করা --- অক্ষর ও অক্ষরাঙ্গ বিচার করা, বর্ণে বর্ণে ভেঙে বানান নয়। বানান ও ইংরেজী স্পেলিং ঠিক এক নয়। যে দেশে পাণিনির ব্যাকরণ বৈদিকভাষার সর্বশেষ ব্যাকরণ, যে দেশে পাণিনির সমান অজস্র ব্যাকরণনয় তৈরী হচ্ছে, সেই দেশে ইউরোপীয়রা এসেই ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ তৈরী করেছে --- এই ভাবনাটা আমরা এতদিন কিভাবে চেতনাহীন ভাবেমস্তিস্কে বয়ে বেড়িয়েছি তা আমি জানি না।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১৮০১ সালে যে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লিখেছিলেন তা হলো ইংরেজী অফিসারদের দক্ষ প্রশাসক হতে সাহায্য করার জন্য ; ভারতীয় রাজনীতি, শাস্ত্র, বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঞ্চবিংশতি পড়ার জন্য; কোন ডায়ালেক্ট নয়, ঢাকাইয়া কুট্টি, চাঁটগাঁইয়া টান বা আঁইআঁই, চবিবশ পরগণার দকনে, যশুরে খুলনার খাতি, যাতি, নাতি নয় --- জ াতীয় মানক ও কথ্য ভাষায় লেখা পড়া করা, কথাবার্তা বলা যাবে, যাতে সেই ভাষায় অস্পষ্ট হিন্দুস্থানী, উড়িয়াদের সংস্পর্শে থেকে হাস্যকর বর্ণ অক্ষরও গদগদ এবং প্রলাপ না করে, যাত্রাই ইংরেজ বিদূষক বা ভাঁড় না সেজে, তাই হাজ ার বছরের প্রশাসনিক, পুঁথি ও দফ্তরের ভাষা শিখিয়েছিলেন --- হাজার বছরের লিখিত নানা বাংলা ব্যাকরণ অবলম্ বনে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com